# রবীন্দ্রনাথ ও রায় পরিবার

সুখেন বিশ্বাস

সেদিন ছিল ১৯১৩-র ২১ জুলাই। রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পাননি। চিকিৎসার সূত্রে তিনি লন্ডনের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি। আর সুকুমার রায় ফোটোগ্রাফি ও ছাপা শেখার কাজে লন্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের 'স্কুল অব ফোটোএনগ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফি'র ছাত্র। এই সময় তিনি আমন্ত্রণ পেলেন লন্ডনের 'ইস্ট অ্যান্ট ওয়েস্ট সোসাইটি' থেকে। রটেনস্টাইন, পিয়ারসন প্রমুখর অনুরোধে তিনি সেখানে পড়লেন বিখ্যাত প্রবন্ধ 'দ্য স্পিরিট অব্ রবীন্দ্রনাথ টেগোর।' তারই কয়েকদিন পরে ছোটবোন শান্তিলতা দেবীকে লেখা সুকুমার রায়ের চিঠি থেকে আরও জানা গেল, তখন লন্ডনে রবি ঠাকুরের খুবই নামডাক। 'রয়্যাল কোর্ট থিয়েটার'-এ 'ডাকঘর' অভিনীত হচ্ছে। 'মালিনী', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি নাটক লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় অভিনয়ের তোড়জোড় চলছে। লন্ডনের বড় বড় কবিরাও তখন রবীন্দ্রনাথের নামে পাগল। সেই সময়ের কবি লরিয়েট ড. ব্রিজেস তো নিজের ছেলেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করানোর জন্য নিয়ে এসেছেন। এতসবের মধ্যে তাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সুকুমারের ওই ভাষণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, এটাই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথে সম্বন্ধে ভারতীয়দের পক্ষে প্রথম পাবলিক ভাষণ। পরে ওই ভাষণটিই প্রবন্ধাকারে লন্ডনের 'দ্য কোয়েস্ট' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

রবিঠাকুরের সঙ্গে সুকুমার রায়ের সম্পর্ক সেই ১৮৮৭ সাল থেকে। জন্মাবধি সুকুমার রবি ঠাকুরকে দেখে আসছেন বলা যায়। সুকুমারের জন্মের অনেক আগে থেকে উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর বিরল প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি মাঝে মাঝে উপেন্দ্রকিশোরকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়ে আনতেন। জানা গেছে, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের বেহালা বাজানোর কথাও। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের স্বরলিপিও লিখেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের মতো ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাতেও তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। আজও ব্রাহ্মসমাজে তাঁর লেখা অনেক গানই গাওয়া হয়। মাঘোৎসবের উপাসনার গান 'জাগো পুরবাসি' তো উপেন্দ্রকিশোরেরই রচনা।

তাঁর নানারকম কাজকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর লেখা বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন তিনি। ঠাকুর বাড়ির 'সাধনা' পত্রিকায় মাঝেমাঝেই

বিশ্বাস, সুখেন : রবীন্দ্রনাথ ও রায় পরিবার
*International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 78-85*



উপেন্দ্রকিশোর লিখতেন। উপেন্দ্রকিশোরের রচনার সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পুণ্যলতা চক্রবর্তী উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতার কথা লিখেছেন 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইয়ে —

"..... বাবার নতুন বই বেরোলেই আনন্দ প্রকাশ করে, আরও লিখবার উৎসাহ দিয়ে তিনি চিঠি লিখতেন। রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি দেশি গল্প শেষ হলে, 'বিদেশি' গল্পের ভাণ্ডারেও হাত দিতে তিনি বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন, কতগুলি বিদেশি বইয়ের নামও বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসতে দেখতাম — এখন তাঁর সাদা চুলদাড়ি ঋষির মতো চেহারার ছবিই তোমরা বেশি দেখতে পাও, তখন আমরা দেখতাম তাঁর কালো কোঁকড়ানো চুল, জোয়ান বয়সের চেহারা। সে চেহারাও অবশ্য খুবই সুন্দর ছিল।"[১]

উপেন্দ্রকিশোর প্রত্যক্ষভাবে কোনও দিন রাজনীতি করেননি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কালে দেশপ্রেমের ঢেউ তাঁকে ভীষণভাবে স্পর্শ করিছিল। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবরের একটি ঘটনাই তার প্রমাণ। ওইদিন কলকাতায় দেশপ্রেমের গান গেয়ে শহর পরিক্রমা করতে একটি মিছিল বেরোয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথে স্বয়ং। মিছিলটি 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গাইতে গাইতে সুকিয়া স্ট্রিটে আসে। দেখামাত্রই উপেন্দ্রকিশোর সেদিন দোতলা থেকে নেমে এসে বেহালা বাজাতে বাজাতে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয়, ইংল্যান্ডের সঙ্গীতবিশারদ ফক্স স্ট্রাঙ্গওয়েজ একসময় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য মিউজিক অব্ হিন্দুস্তান' প্রকাশ করেন। ওই বইয়ে রবীন্দ্রগানের 'স্টাফ নোটেশন' করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই সময় ওই কাজটি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর স্বয়ং। অন্যদিকে 'দ্য স্পিরিট অব্ রবীন্দ্রনাথ টেগোর' লেখা ছাড়াও সুকুমার লন্ডনে বসে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। 'সুদূর, 'পরশপাথর,' 'সন্ধ্যা', 'কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ' ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় অনূদিত কবিতাগুলো আজ আর পাওয়া যায় না। পাওয়া যায়নি ১৯ জুন ১৯১২ সালে অনুষ্ঠিত পিয়ারসন সাহেবের বাড়িতে সুকুমার রায়ের পড়া প্রবন্ধটিও। উপস্থিত সভ্যগণের একজন দেবপ্রসাদ অধিকারী 'য়ুরোপে তিন মাস' নামক স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, একজন বাঙালি বিলাতপ্রবাসী বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবিবাবুও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রবিবাবু সকলের অনুরোধে স্বরচিত একটি গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ যতদিন লন্ডনে ছিলেন, ততদিনই সুকুমার ছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গী। এদেশে সেকালের রবীন্দ্রবিরোধিতার মাঝখানে রবীন্দ্রপ্রিয় মুষ্টিমেয়দের অন্যতম ছিলেন সুকুমার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ প্রমুখ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিষ্য। কিন্তু সুকুমার এঁদের থেকে আরও বিশিষ্ট। কারণ তিনি রবীন্দ্র-ঘারানার লোক হলেও তাঁর রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব একদম ছিল না।

'নন্‌সেন্স্ ক্লাব'-এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'-র আদর্শে সুকুমার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'মণ্ডা ক্লাব'। এই ক্লাবে নিয়মিত রবীন্দ্র-স্মরণ ছিল আবশ্যিক কাজ।

রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়া, রবীন্দ্র-কবিতা পাঠ, রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা এসব করাই ছিল এই ক্লাবের কাজ। পাশাপাশি রবীন্দ্র-নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করাতেও সুকুমার ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রবি ঠাকুরের গানের প্যারডি রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানের কথা ও সুরের আদলে তিনি রচনা করেছিলেন মণ্ডা ক্লাবের জাতীয় সঙ্গীত — 'মণ্ডা সম্মিলন' এব 'বিশ্ববীণা রবে'-এর অনুকরণে তিনি লেখেন — 'বৃষ্টি বেগ ভরে রাস্তা গেল ডুবিয়ে।' তার মানে এই নয়, সুকুমার শুধুই প্যারডি লিখতেন। তিনি অনেক ভালো গানও লিখেছিলেন। তাঁর লেখা অনেক গান আজও ব্রাহ্মবিবাহে গাওয়া হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ছিল যে পরাণের অন্ধকারে'-এর সুরের আদলে তিনি লিখেছিলেন 'প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে'। আর 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে'-এর আদলে 'নিখিলের আনন্দ গান।' সেই সময় শান্তিনিকেতনে সুকুমারের যাতায়াত ছিল নিয়মিত। তিনি ছিলেন ওখানকার সব উৎসবের নিয়মিত অতিথি। তেমনি রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সুকুমারের জীবনের অনেক ঘটনার সঙ্গী। ১৯১৩-র ১৩ ডিসেম্বরের একটি ঘটনা এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। সেদিন সুকুমার-সুপ্রভার বিয়েতে রবি ঠাকুরের হঠাৎ আগমনে সকলেই চমকে গিয়েছিলেন। সীতা দেবীর বিখ্যাত 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থের সরস বর্ণনা সে কথাই বলে —

"রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন শুনিয়াছিলাম। বিবাহ প্রায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে, এমন সময়ে গেটের কাছে করতালিধ্বনি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই দেখিলাম কবি আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম, এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্যই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুকুমারবাবুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।"[২]

সুকুমারের মতো সুপ্রভা দেবীও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী। তাঁর গানের গলাও ছিল অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা অনেক গান সুপ্রভাদেবীকে শিখিয়েছিলেন। নোবেল পাওয়া উপলক্ষে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪-তে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে কবিকে রামমোহন লাইব্রেরিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সুকুমার ছিলেন সংবর্ধনা কর্তাদের একজন। সুপ্রভা দেবীও এই অনুষ্ঠানে সেদিন অংশ নিয়েছিলেন। কবির সম্মানার্থে তিনি সেদিন একটি গানও গেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল গড়পারের 'রায় পরিবার'। রটেনস্টাইন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখকে নিয়ে যান ইংল্যান্ডের 'নাইট্‌স্ ব্রিজ'-এ। সেখানকার 'স্টুয়াট্‌স্ স্টুডিয়ো'তে সকলে মিলে একটা গ্রুপ ছবি তোলেন। কিন্তু এখন? সেই নোবেল চুরির সংবাদে স্তম্ভিত রায় পরিবার। এখনও তাঁরা ভাবতেই পারছেন না খোদ শান্তিনিকেতন থেকে নোবেল চুরি হতে পারে। সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ তো বলেই ফেললেন, "আমার মা-ও এ খবরটা শুনে স্বভাবতই অবাক।" রায় পরিবারের মানুষেরা শোকে বাক্‌হীন, "কী বলব। আমরা সকলেই মর্মাহত।"

নোবেল পাবার পর দেশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্মানিত সদস্যপদ দিতে



রাজি ছিলেন না। সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে সদস্যপদ দেওয়ার পক্ষে প্রথম সওয়াল করেছিলেন সুকুমার রায়। তাঁর পক্ষে ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডা. নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ। আর বিপক্ষে প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ। আলোচনা সভায় গণভোটের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভোটের চারদিন আগে সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ৫২ পৃষ্ঠার পুস্তিকার বিষয় ছিল — 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই?' ১৯২১-এর ১৯ মার্চ গণভোট হল। রবীন্দ্রনাথ জিতলেন ৪৯৬-২৩২ ভোটে। সুকুমারের স্বচ্ছতার জয় সেদিন হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু দীর্ঘতর আন্দোলনের ক্লান্তি তাঁকে যেন মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছিল। ১৯২০-র ২৩ আগস্ট তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একটি 'কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল' চিঠি লেখেন, যার মধ্যে ছিল —

".... আমার জীবনের মধ্যে একটা বড় crisis বা turning point আসছে, সেটা যে কি তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু ... সেটা death ছাড়া আর কিছু নয়।"

ওই চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন —

"I decline to think about .... Rabi Babu's election & other similar things."

সুকুমারের দুশ্চিন্তা ক্রমশই বাস্তব হল। এর পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বহুবার দেখতে এসেছেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে 'পূর্ণতা ও আনন্দের গান' শুনতে চাইতেন। অবশেষে ১৯২৩-এর ১০ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকে গেলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দিরে সুকুমারকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ দেন। পরে সেটি 'মন্দিরের উপদেশ' নামে 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'য় (ভাদ্র ১৩৩০) ছাপা হয়েছিল —

".... এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে আমার মনে বেজে উঠেছে তার কারণ, সেদিন সেই যুবকের মৃত্যুশয্যায় দেখলুম সুদীর্ঘকাল দুঃখভোগের পরে' জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মতো এতবড় বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে পরম শত্রু বলে' জানে, তাঁকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেয়েচেন। তাই আমাকে গাইতে অনুরোধ করেছিলেন — 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে, / তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্দ জাগে'। ... যে গানটি তিনি আমাকে দু'বার অনুরোধ করে শুনলেন সেটি এই 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে, / আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে।'....."

মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে অসীমের জয়গান আর কারাই বা করেছেন? মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান ব্রাহ্ম পরিবারের মানুষ ছাড়া আর কাদেরই বা করতে দেখা গেছে? রবীন্দ্রনাথও মৃত্যুর জয়গান গেয়ে বলেছিলেন যে, জীবন ও জগৎকে জানতে হলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই জানতে হয়। আর তার মূলে আছে আনন্দ। উপনিষদে এই আনন্দের কথাই বলা হয়েছে, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে / আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্য-ভিসংবিশন্তি।' এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের চরম পরিণতি দেখা যায় উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যেও। তাঁর কাছেও মৃত্যু

এসেছিল পরম মিত্ররূপে। মৃত্যুর ঠিক আগে পরিজনদের উদ্বিগ্নতা দেখে তিনি বলেছিলেন —

"তোমরা আমার রোগক্লিষ্ট দেহকে দেখিতেছে; আমার অন্তরে কি আরাম, কি শান্তি, তাহা যদি দেখিতে, তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না — আমি আনন্দেই আছি, আনন্দেই থাকিব।"[৩]

মৃত্যু ভাবনায় একাকার হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর আর সুকুমারের দার্শনিক উপলব্ধিজাত সত্যতা। জীবলোকের ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মলোকের অবস্থান, দুঃখ যন্ত্রণার মাঝে আনন্দের সন্ধান, মৃত্যুর মধ্যে 'পরম প্রাণের ব্যঞ্জনা' এই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁরা তাঁদের মৃত্যু ভাবনার মধ্য দিয়ে।

সুকুমারের মৃত্যুর পরের দিন (২৪ ভাদ্র ১৩৩০) শান্তিনিকেতন থেকে সুপ্রভাদেবীকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি লেখেন। গভীর আক্ষেপে তিনি সেদিন লিখেছিলেন —

"তোমার এই গভীর শোকে তোমাকে সান্ত্বনা দেবার যোগ্য কোনো কথা আমি জানিনে। .... আমি নিশ্চয় জানি তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে তোমার জীবনের একটি মহৎ দীক্ষা তুমি লাভ করেচ, আজ দুর্দিনে সেই দীক্ষাই তোমাকে রক্ষা করবে। .... এই কথা স্মরণ করে' তুমি সান্ত্বনা লাভ কর; ঈশ্বর তোমায় শান্তি দিন, তোমার শোককে কল্যাণে সার্থক করুন। ..."

অল্প বয়সেই সুপ্রভা দেবীর এই অপূরণীয় শোকের কল্যাণরূপের প্রতীকই বোধহয় 'সত্যজিৎ রায়'। সুকুমারের মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছিল, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশোক ব্যথিত করেছিল সত্যজিৎকে। তাই বোধহয় 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে সত্যজিতের ভাষণ এই সংকট মুহূর্তে আমিদেরও আশ্বস্ত করে, নতুন করে উদ্দীপ্ত করে। ছবির শুরুতে দেখা যায় কবির মরদেহের সঙ্গে শোকযাত্রার ছবি। শোকে উন্মাদ জনতা, পরে রাতে শ্মশানে দাহের চিত্র। এই সময়ই ঘোষকের কণ্ঠে শোনা গেল —

"... রাত্রের মধ্যে মানুষটির মরদেহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল ... কিন্তু তাঁর কবিতা, গান, সাহিত্য, ছবি ও মানবতাবোধ অমর হয়ে রইল।"

সত্যজিতের এই ভাষণ তো রবীন্দ্রনাথেরই দার্শনিক চেতনার প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ তো মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' নোবেল চুরি হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের মন থেকে রবীন্দ্রনাথ তো চুরি হননি। পদক-চোরেরা তো রবীন্দ্রনাথকে মারতে পারেনি। শুধু শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণ নয়; কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ বা সোনাঝুরির ছায়ায় নয়, রবীন্দ্র-সত্তা তথা রবীন্দ্রনাথের অবস্থান মানুষের মনে — আনন্দের সৃজনশীলতায়।

নোবেল চুরির খবরে দেশজুড়ে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছিল ঠিকই। প্রথমে খবরটা শুনে অনেকেই ভেবেছিল, এমন কী হতে পারে? কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবিশ্বাস বদলে যায় ক্ষোভে-শোকে-হতাশায়। কেউ স্তম্ভিত, কেউ কেঁদেছে, কেউ-কেউ উগরে দিয়েছিল রাগ, 'সারা বিশ্বের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেল।'



কিন্তু যতদিন যাচ্ছে ততই নোবেল চুরির খবরাখবরে মানুষের আগ্রহ কমেছে। কিন্তু কমে যায়নি রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরে মানুষের নতুন করে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন। রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ে, রবীন্দ্র-নাটকে অভিনয় করে, রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস তো রবীন্দ্রনাথেরই জয়। রবি ঠাকুরের 'সাহিত্য কোষ' মানেই মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। ঠিক এই কথাটাই উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমারের মতো বুঝতে পেরেছিলেন সত্যজিৎ। তাই তিনি সিনেমায়, তুলির রেখায়, সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে রচনা করেছিলেন এক 'অনিন্দসুন্দর শিল্পজগৎ।'

রবীন্দ্র-গল্পের চলচ্চিত্রায়ণে সত্যজিৎ আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভেসে যাননি। বরঞ্চ বিচার, বিশ্লেষণ ও নিরবধি জিজ্ঞাসায় এগিয়ে গেছেন। 'তিনকন্যা'র 'পোষ্টমাস্টার' পর্বে রতনের অন্তিম প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তার কান্নার প্রসঙ্গ। সত্যজিৎ সিনেমায় দেখিয়েছেন তার জল তুলে আনা। অর্থাৎ 'রতনের দাসত্ববোধ'। 'মণিহারা'-র মণিমালিকা তো সত্যজিতের পুনরাবিষ্কার। আর 'সমাপ্তি'-র মৃন্ময়ী? সত্যজিতের ক্যামেরায় নারীত্বের মধুর বিকাশ। তার ঠোঁটের কোণে হাসি, মাথার ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়াতেই যেন মৃন্ময়ীর দুরন্তপনা, বেপরোয়াভাবের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' কোনও পরিচালকের হাতে কীভাবে যে হয়ে ওঠে আরেক শিখরস্পর্শী শিল্পনির্মাণ, তার উজ্জ্বলতর উদাহরণ সত্যজিতের 'চারুলতা।' 'ঘরে বাইরে' ছবিতে তো সত্যজিৎ রবীন্দ্রভাবনার সত্যগুলো দেখিয়েছেন। এখানে ঘর আসলে সত্যেরই উপলব্ধি। ওই ঘরে ঢোকা সম্ভব একমাত্র রবীন্দ্রচিন্তায়। কখনই সন্দীপের মতো করে নয়। সত্যজিত তাঁর অন্যান্য ছবিতেও রবিঠাকুরের দার্শনিক ভাবনাকে অসীম মহিমায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে প্রথম থেকেই সত্যজিতের মধ্যে ছিল অঙ্কনের সহজাত দক্ষতা। শান্তিনিকেতনে পড়তে এসে শিখেছিলেন প্রকৃতিকে দেখার জ্ঞান ও প্রয়োজনীয়তা। তাই 'চারুলতা', 'তিনকন্যা', 'ঘরে বাইরে' বা অন্যান্য ছবির পোষ্টার, বিজ্ঞাপন বা লিপি নির্মাণে লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্র-ঘরানা। রবীন্দ্রনাথের মুখাবয়ব অঙ্কনেও তিনি বৈচিত্র্যময়। রবীন্দ্র কাহিনি ছাড়াও 'রাজকাহিনী,' 'বনলতা সেন', 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রচ্ছদেও পাওয়া যায় রাবীন্দ্রিক মেজাজ। তাঁর চলচ্চিত্র, অলঙ্করণ বা প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ধ্রুপদী মেজাজ ও সংযমশীলতার যে প্রবহমানতা, তা রবীন্দ্রপ্রভাব ছাড়া আর কিই বা হতে পারে। রবীন্দ্রঘারানাকে গ্রহণ করে ওঁরা স্বতন্ত্র ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন, সেটা 'রায় ঘরানা।'

বাবা বা ঠাকুরদার মতো সত্যজিতও ছিলেন সঙ্গীতে পারদর্শী। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর তাঁকে মুগ্ধ করলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল তাঁর প্রাণের স্পন্দন। তাই তাঁর ছবিগুলোতে দেখা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুপ্রয়োগ। ধরা যাক, 'জনঅরণ্য'-র কথা। কোনও এক সন্ধ্যার অন্ধকারে সোমনাথ, কমলা (বৌদি) ও দ্বৈপায়ন (বাবা) বসে আছে। সোমনাথ চাকরি পাচ্ছে না। বাড়ির সকলেই চিন্তিত। পটভূমির অনিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য রেডিওতে শোনা গেল রবি ঠাকুরের গান — 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।' অন্যদিকে 'চারুলতা'য় অমলের 'ইয়ুথফুলনেস' বোঝানোর জন্য 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'-এর তো কোনও তুলনাই হয় না। লাবণ্যর একাকীত্ব, মানসিক দ্বন্দ্ব

বোঝানোর জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন দার্জিলিঙে 'এ পরবাসে রবে কে' ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় কি? একটি গানের ব্যবহারে সত্যজিৎ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'কে হিমালয়ের শিখর দেশে তুলে ধরেছেন।

'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে তিনি ন'টি (আংশিক/সম্পূর্ণ) রবীন্দ্রগানের প্রয়োগ করেছেন। তথ্য ও গানের প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী চরিত্রটি আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নোবেল চুরির ঘটনায় কলকাতা-দিল্লি তোলপাড় হয়েছে। দেশজুড়ে রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে। সীমান্তে-সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা। সি.আই.ডি/সি.বি.আইয়ের তদন্ত। ইন্টারপোলকে তলব। সুইডিস অ্যাকাডেমিতে খবর। চোরদের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের নোবেল ফিরিয়ে দেওয়ার কাতর অনুরোধ। মন্ত্রী-আমলাদের উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি। লোকমুখে গুঞ্জন, 'রবীন্দ্র সংস্কৃতিও কি হারিয়ে গেল?' সুকুমার, রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ বেঁচে থাকলে তাঁরাও কি একই কথা বলতেন? বোধ হয় না। তাই তো সত্যজিৎ 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তির ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। 'মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ।' রবি ঠাকুর একসময় মানবদেবতার ধারণাকে আশ্রয় করে লিখেছিলেন একটি গান। সত্যজিৎ রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে প্রভাবিত হয়েই এই ছবিতে প্রয়োগ করলেন সেই গানটিই — 'ওই মহামানব আসে...।'

একদিন ছোটবেলায় সত্যজিৎ মায়ের হাত ধরে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়। রবীন্দ্রনাথের সামনে অটোগ্রাফ নেওয়ার ইচ্ছায় এগিয়ে দিয়েছিলেন একটি খাতা। স্নেহচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ পরের দিন লিখে দিয়েছিলেন আট লাইনের একটি কবিতা —

"বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্ব্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"[৪]

সবচেয়ে আশ্চর্যের, সেদিনের সেই বালক রবীন্দ্রনাথের নাম আজ একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ যেমন বাঙালির, তেমনি বিশ্বমানবের। দু'জনেই বাঙালির বিকশিত সত্তার প্রতীক। বৈশাখের দুরন্ত কালবৈশাখী প্রকৃতি এলোমেলো করলেও বৈশাখই আমাদের আশীর্বাদ। বৈশাখে জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ। বৈশাখেই এই দেশের বুকে এসেছেন সত্যজিৎ। বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতি-চেতনায় একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে ওঁদের দুই পরিবারের নাম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার আর গড়পারের রায় পরিবার জাতীয় সংস্কৃতির দুটি বিশাল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রবিঠাকুরের সঙ্গে রায় পরিবারের সম্পর্ক তিন পুরুষের। উপেন্দ্রকিশোরই প্রথম



রবীন্দ্র গানের 'স্টাফ নোটেশন' করেন। সুকুমারই লন্ডনের বিদ্বৎসমাজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে প্রথম পাবলিক ভাষণ দেন। লেখেন 'দ্য স্পিরিট অব্ রবীন্দ্রনাথ টেগোর'। তিনিই প্রথম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে নিজের জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছেন। আর সত্যজিৎ? তিনি তো চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে, তুলির টানে, সঙ্গীতে রবীন্দ্রস্বাদকে ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশেবিদেশে। পদক চুরি হয়ে গেছে 'রবি কোষে' কিন্তু অক্ষত আছে 'রায় কোষ।' উপেন্দ্রকিশোরের পাণ্ডুলিপি, সুকুমারের খেরোর খাতা-পদক-পাণ্ডুলিপি, সত্যজিতের খেরোর খাতা, পাণ্ডুলিপি, লিজিয় দ্য অনার, অস্কার সবই অক্ষত। অচলায়তনের অন্ধকার সরিয়ে উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সত্যজিৎ যেভাবে বাঙালি মানসে রবীন্দ্রপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তাতে নোবেল চুরি বা ফিরে পাওয়াতে কীই বা এসে যায়। তাই প্রশ্ন জাগে 'রায় পরিবারের রবীন্দ্রনাথ, না কি রবীন্দ্রনাথের রায় পরিবার!'

পাদটীকা :

১। পুণ্যলতা চক্রবর্তী : 'ছেলেবেলার দিনগুলি' (১৯৯৭), পৃ. ১০৫
২। সীতা দেবী : 'পুণ্যস্মৃতি' (১৪০৭), পৃ. ৫০
৩। হেমন্তকুমার আঢ্য : 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী' (১৯৯৭), পৃ. ৫৪তে দ্রষ্টব্য
৪। সত্যজিৎ রায় : 'যখন ছোট ছিলাম' (১৯৯৬), পৃ. ৩৭

*Sukhen Biswas, Department of Bengali, Kalyani University, West Bengal*